

কমলিগুয়ালার দেশে

ফাহমিদ-উর-রহমান



গার্ডিয়ান

পা ব লি কেশ ন স

তুমি না আসিলে মধু ভাঙার ধরায় কখনো হত না লুট,
তুমি না আসিলে নারগিস কভু খুলতোনা তার পর্নপুট,
বিচিত্র আশা-মুখর মাগুক খুলতো না তার রন্ধ দিল;
দিনের প্রহরী দিত না সরিয়ে আবছা আঁধার কালো নিখিল ।

—ফররুখ আহমদ

এক

মদিনার আকাশে প্লেন চক্কর দিতেই জানালা দিয়ে চোখে পড়ল উহুদ পাহাড়। নিচে তাকিয়ে দেখি, কালো ধোঁয়ার মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে কী যেন ওপরে উঠছে। উহুদ হচ্ছে একটা পাথুরে পাহাড়। আরবের সব পাহাড়ই পাথরে তৈরি। সবুজের কোনো নামগন্ধ নেই। কতদিন যে ওর শরীরে বৃষ্টির স্পর্শ লাগেনি, তাও হয়তো কেউ জানে না। প্রচণ্ড রৌদ্রের দাবদাহে এই পাথরগুলো অনাদিকাল ধরে পুড়তে পুড়তে আলকাতরার মতো কালো হয়ে গেছে। সেই ঘোর লাগা কালো রং দেখে এখন মনে হচ্ছে ধোঁয়ার কুণ্ডলী।

আরেক চক্কর দিয়ে প্লেন মদিনা এয়ারপোর্টের রানওয়েতে নেমে এলো। প্লেনের ক্যাপ্টেন এলান করে দিলেন—আমরা রসূলের শহরে পৌঁছে গেছি, আহলান ওয়া সাহলান। রিয়াদ এয়ারপোর্টে ট্রানজিট ছিল কয়েক ঘণ্টার। ওখানেই ইমিগ্রেশনের আনুষ্ঠানিকতা শেষ হয়েছিল। তাই মদিনায় এসে ওসবের ব্যক্তি তেমন পোহাতে হয়নি।

মদিনায় তখন সকাল। মেঘমুক্ত আকাশ। কিছুটা ধীর লয়ে বাতাস বইছে। মানুষের আনাগোনা কোলাহল তেমন একটা নেই। এক অদ্ভুত শিহরন ও পুলকে মন যেন নেচে উঠেছে। এই সেই শহর। এর আকাশ-বাতাস, পর্বত-গিরিখাদ, জনপদ রসূলের স্মৃতি বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই শহরের বুকের ওপর দিয়ে নুরের নবি চলাফেরা করতেন। মা আয়শা, বিবি ফাতিমা, আবু বকর, উমর, উসমান, আলি হায়দার, ইমাম হাসান-হোসেন—ইসলামের সনাতন ও শুদ্ধ যে ছবি আমরা জানি, তা এই শহরের জঠরের মধ্যে লুকিয়ে আছে। আদি ইসলামের মহাফেজখানা মদিনা শহরের সদর দরজার সামনে এসে আমরা দাঁড়িয়েছি। এই শহরেই শুয়ে আছেন নুরের নবি, সরোয়ারে কায়েনাত, রহমতুল্লিল আলামিন, শাফিউল মুজনাবিন হজরত মুহাম্মাদ (সা.)। তিনি আমাদের শাফায়েতকারী। আমরা শাফায়েতের আশায় তাঁর দরবারে সালাম পেশ করতে এসেছি। হে নুরের নবি, তুমি আমাদের সালাম ফিরিয়ে দিয়ো না।

এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে বাসে উঠি। এবার আমাদের গন্তব্য মসজিদে নববির লাগোয়া হোটেল মোভেনপিক। মদিনায় যে পাঁচ দিন থাকব বলে স্থির হয়েছে, সেটা এই হোটেলে। মসজিদে নববির চারপাশজুড়ে হোটেল আর সুপারমার্কেট গড়ে উঠেছে। এগুলোকে কেন্দ্র করে হজকেন্দ্রিক বাণিজ্য জমজমাট হয়ে ওঠে। আমাদের বাস ছেড়ে দিয়েছে। কখনো পাহাড়ের ঢাল দিয়ে, কখনো আবাসিকের ভেতর দিয়ে, কখনো বাণিজ্যিক এলাকার বুক চিরে বাস এগিয়ে যায়। মদিনার বাড়িঘর-ইমারত ফিকে হলুদ রঙে মোড়ানো। এসব বাড়িঘরে বারান্দা থাকে না। জানালাও অনেকটা না থাকার মতো। অনেক উঁচুতে বায়ু প্রবেশের পথ আছে বটে, কিন্তু তাও বন্ধ থাকে। বাইরে থেকে পুরো আরবের ইমারতগুলোর চেহারাই এ রকম। নান্দনিকতার নামগন্ধ নেই। হঠাৎ দেখলে মনে হয় খসখসে রুক্ষ, যেন এক একটা ক্ষুদ্রাকৃতির দুর্গ।

পরে এক আরব আমাকে বলেছিল চরম আবহাওয়ার কারণেই বাড়িঘরের নকশা এ রকম করতে হয়েছে। এদেশে সূর্যের দাবদাহ আছে; মরুঝাড়ের আশঙ্কা আছে। সুতরাং এখানকার গৃহ নির্মাণের একটা উদ্দেশ্য হলো তাপ থেকে, ধূলিকণা থেকে আত্মরক্ষা করা। ফলে এদেশে এদের আবহাওয়া উপযোগী এক গৃহ নির্মাণশৈলী গড়ে উঠেছে। আরব স্থাপত্য বুঝতে হলে এটা আমাদের বিবেচনায় রাখতে হবে।

মরুভূমির বেদুইনদের তাঁবু চারিদিক থেকে ঘেরা থাকে, ছাদ হিসেবে থাকে এক সুচালো আবরণ এবং চারিদিকের মুক্ত প্রান্তর থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন। এটাও এখানকার একটা বিশেষ ধরনের গৃহ নির্মাণশৈলী। এমনকি যে কাবাঘর তার কোনো জানালা নেই, আছে একটিমাত্র দরজা। অবশ্য ছাদটি সমান্তরাল। এভাবে কাবাঘরও এদেশের একটি স্থাপত্যশিল্প। অবশ্য এটিকে বলতে হবে একটি বিমূর্ত শিল্প। এর আকৃতিতে কোনো হেরফের নেই। কিউবের মতো এটি দণ্ডায়মান রয়েছে।

ওই আরব আমাকে হাসতে হাসতে বলেছিল—বাইরে রক্ষ হলেও ভেতরের পরিবেশে কমনীয়তার অভাব নেই। গৃহের ভেতরকার সাজসজ্জা ও শোভা-সৌন্দর্য রীতিমতো মনোমুগ্ধকর। তাই বাইরের পরিবেশ দিয়ে ভেতরটা মাপা হয়তো ঠিক নয়।

একেবারে ঠিক বলেছ। কমনীয়তা সব সময় গোপনেই থাকে। অগোচর, অপ্রকাশই তার বৈশিষ্ট্য। বিনুকের ভেতরে যেমন মুক্তো আর পাথরের ভেতরে যেমন ঝরনা লুকিয়ে থাকে।

আমার উপমা শুনে আরবতো উল্লসিত—এত রীতিমতো শুয়ারাদের জবান! ওরাইতো এ রকম জবানে কথা বলে।

আমি বললাম—আরবরা জাত কবি। ওদের শিরায় শিরায় কবিতার উল্লাস। ওদের দেশে এসে আমার জবানও কিছুটা ওরকম হয়ে গেছে।

এর মধ্যে বাস এসে থামলো হোটেল মোভেনপিকের সদর দরজায়। আল বাইয়েত এজেসির প্রতিনিধিরা আমাদের ফুল দিয়ে অভিবাদন জানাল। একে তো নবির শহরে পদার্পণ, তারপর ফুলের অভিবাদন—হজ যাত্রার এ প্রথম অভিজ্ঞতা মনটা পুরোপুরি ভিজিয়ে দিলো। বলা দরকার, আল বাইয়েত এজেসির মাধ্যমেই আমরা হজের প্যাকেজটা নিয়েছিলাম। মোভেনপিক একটি বিশালকায় হোটেল। এর কয়েকটি টাওয়ার। আমাদেরটার নাম মদিনা টাওয়ার। পুরো নাম আনোয়ার আল মদিনা। এই টাওয়ারের ১৩ তালার একটি কক্ষে আমাদের জায়গা হয়েছে। সেই কক্ষের জানালা দিয়ে দেখছি মসজিদে নববির ল্যান্ডস্কেপ, আকাশের দিকে মিনারের সটান উঠে যাওয়া, হজ যাত্রীদের আনাগোনা আর অগণিত কবুতরের বাকবাকুম গুঞ্জরনে মুখরিত প্রাঙ্গণ। জানালা দিয়ে আমি তাকিয়ে থাকি মসজিদে নববির এক কোনায় সবুজ গম্বুজের দিকে। ওর নিচে রসূল (সা.)-এর রওজা মোবারক। ওই সবুজ গম্বুজ আমাকে স্বপ্ন তাড়িত মানুষের মতো এক মায়াবী জগতে টেনে নিয়ে যায়। এখানে আসবার জন্য কতদিন চোখের পানিতে বুক ভাসিয়েছি। সেই স্বপ্ন আজ হাতের মুঠোয়। সবকিছুর সীমানা পেরিয়ে এক অলৌকিকতার ডাকে আমি যেন দৌড়াতে শুরু করেছি। আমার ঠোঁটের অস্ফুট আওয়াজে তখন বেরিয়ে আসছে কাজী কবির সেই বিখ্যাত মুনাজাত—ত্রাণ করো মওলা মদিনার, উম্মত তোমার গুনাহগার কাঁদে।

দুই

আসরের নামাজের বেশ আগে আমি মসজিদে নববির সিংহ দরজার সামনে এসে দাঁড়াই। এ দেশে আমাদের দেশের মসজিদগুলো থেকে বেশ আগে আজান দেওয়া হয়। নামাজও কিছুটা আগে পড়া হয়। খেয়াল করলাম, এখানকার মসজিদে তাহাজ্জুদের আজানও দেওয়া হয়। সৌদি আরবের রাজধর্ম হচ্ছে ইসলাম ধর্মের এক বিশেষ শাখা ওহাবি ইসলাম। এর নীতি অনুসারেই এভাবে আগে আজান ও নামাজের রীতি এখানে বর্তমান।

হজের সময় বিশেষ করে মক্কা ও মদিনার দুই পবিত্র মসজিদে স্থান সংকুলান হয় না। তাই নামাজের নির্ধারিত সময়ের বেশ আগে যেয়ে মসজিদে জায়গা নিতে হয়। অন্যথায় মসজিদের বাইরে অথবা রাস্তায় দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে হয়। আমি যে মসজিদের সামনে দাঁড়িয়ে আছি, তা কিন্তু সেই সপ্তম শতাব্দীতে রসূলের হাতে গড়া খেজুরগাছ আর কাদামাটির সহযোগে তৈরি কোনো মসজিদ নয়। যে মসজিদের কোনো ছাদ ছিল না, ছিল চারিদিকের দেওয়াল আর তিনটি দরজা। এখানে বসেই নবিজি তার ধর্মীয় ও প্রশাসনিক কাজকর্ম করতেন। এখানে বসেই ইসলামের আদি খলিফারা আধেক পৃথিবী শাসন করতেন।

রসূল (সা.) যখন মদিনা আসেন, তখন তার উট কাসওয়া এই জমি খণ্ডটির ওপর বিশ্রামের জন্য বসে পড়ে। এই জমির মালিক ছিল নাজার গোত্রের সাহাল ও সোহায়েল নামক দুই এতিম বালক। এদের কাছ থেকে নবিজি জমিটি কিনে মসজিদ ও নিজের জন্য বাসগৃহ নির্মাণ করেন। এটি ছিল ইসলামের দ্বিতীয় মসজিদ। প্রথমটি ছিল মসজিদে কুবা। মদিনায় প্রবেশ করেই নবিজি এটা তৈরি করেন। এই মসজিদের লাগোয়া ছিল নবিজির বাসস্থান; এই বাসার দরজা দিয়ে বের হয়ে তিনি মসজিদে প্রবেশ করতেন। নবিজির বাসা ও মসজিদের মিম্বরের মাঝখানের জায়গাটাকে বলা হয় রিয়াজুল জান্নাহ—বেহেশতের বাগান। নবিজি বলেছেন, এখানে দুআ করলে তা কবুল হয়। আজও তাই অগণিত পুণ্যার্থী এই জায়গাটুকুতে বসে ইবাদত করবার জন্য তৃষ্ণার্ত চাতকের মতো অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেন।

স্মৃতি হাতড়ালে এ রকম অনেক কিছুই হয়তো চোখের সামনে ভেসে উঠবে। কিন্তু নবিজির রওজা মোবারক ছাড়া এখন আর সেদিনের মদিনার তেমন কিছুই অবশিষ্ট নেই। কালের ধাক্কায় সবকিছুই ধুয়ে মুছে গেছে। সেটাই হয়তো স্বাভাবিক। সপ্তম শতাব্দীর জীবন-সমাজ-পরিবেশ পুরোটাই পালটে গেছে। আধুনিক নগর জীবনের বহুভঙ্গিমা মদিনাকেও ঘিরে ধরেছে। খেজুর পাতার মসজিদ এখন পরিণত হয়েছে মার্বেল পাথরের জমকালো মসজিদে।

ইতিহাস ঘেঁটে বলা যায়, এটি হচ্ছে ইসলামি স্থাপত্যের প্রথম বলিষ্ঠ নিদর্শন। নবিজির ইস্তিকালের পর থেকে ইসলামের খলিফারা এ মসজিদের নানা রকম সংস্কার, সম্প্রসারণ ও সৌন্দর্যবর্ধন করেছেন। সময়ের প্রয়োজনেই এটা করতে হয়েছে। সবশেষে এটার সংস্কার কাজে হাত দেয় অটোমান খলিফারা। ওরাই নবিজির রওজা মোবারকের ওপর সবুজ গম্বুজ নির্মাণ করে। যেটা এখনও বহাল তবিয়তে আছে। অটোমানদের পরে আসে ওহাবিরা। এরাও মসজিদের বিস্তার সম্প্রসারণ করেছে। ওহাবিদের সাথে অটোমানদের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মতবিরোধ ছিল। ওহাবিরা আসার পর মসজিদে নববির অনেক অটোমান চিহ্ন মুছে ফেলা হয়।

কিন্তু তারপরেও বলতে হবে, সবকিছু মোছা সম্ভব হয়নি। বর্তমানের যে মসজিদ, এটির স্থাপত্যকে বলা যায় অটোমান ও ওহাবি চিন্তার সংশ্লেষে তৈরি। রাজনীতির জগতে যা হয় না, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সেটা অনেক সময় ঘটে যায়। রাজনীতির বিরোধ পরিণত হয় সংস্কৃতির সমন্বয়ে। এ কালের মসজিদে নববি তার বড়ো উদাহরণ।

মসজিদটা দেখতে অনেকটা আয়তাকার। এর অভ্যন্তরভাগ মার্বেল ও স্টোন দিয়ে সজ্জিত। ভেতরের কলামগুলো সাদা মার্বেল দিয়ে তৈরি। এর শীর্ষভাগ পিতল দিয়ে মোড়া, যা সাদা ও কালো পাথরে তৈরি আর্চগুলোকে ধরে রেখেছে। মসজিদের অভ্যন্তরে দীর্ঘ কলামের সারি এবং আর্চের পরম্পরা এমন একটা সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে, যা দৃষ্টিকে দীর্ঘক্ষণ ধরে আটকে রাখে। এই কলাম ও আর্চের ওপরে গম্বুজ প্যাটার্নের ছাদ। কলাম, আর্চ ও গম্বুজ প্যাটার্নকে ঘিরে অলংকরণ ও ক্যালিগ্রাফিও নজরে আসে। দেওয়ালজুড়ে জানালাও আছে, যার শীর্ষটা প্রিজম আকারের পাথরের খিলান দিয়ে তৈরি; যেন সুচালো হয়ে ওপরে উঠে গেছে।

মসজিদে নববিতে গম্বুজ বলতে নবিজির রওজা মোবারকের ওপরে সবুজ গম্বুজই সার। আর কোনো গম্বুজ সেখানে নেই। মিনার আছে তবে সেটা অটোমান মসজিদের মতো সুচালো নয়। অটোমান মসজিদের মধ্যে থাকে গ্রান্ডনেস— বিশালতার মহিমা। আরব মসজিদের বৈশিষ্ট্য হলো সিমপ্লিসিটি—সরলতার উদ্‌যাপন। আরব মসজিদগুলোর বৈশিষ্ট্য তাদের অসাধারণ সুন্দর মিনারের জন্য। অটোমান মসজিদের বৈশিষ্ট্য তার গম্বুজের জন্য। হারাম শরিফে কোনো গম্বুজ নেই। কিন্তু সুউচ্চ ও সুদৃশ্য কয়েকটি মিনার রয়েছে।

মসজিদের বাইরে যে খোলা চত্বর, সেটি এখন স্বয়ংক্রিয় ছাতার মতো একধরনের তাঁবু দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে, যাতে মুসল্লিরা রোদ-বৃষ্টি থেকে রেহাই পেতে পারে। এই তাঁবু যখন ইচ্ছা বুজিয়ে দেওয়া যায়, যখন ইচ্ছা মেলে দেওয়া যায়। এই প্রযুক্তি জার্মানি থেকে নিয়ে আসা হয়েছে। এই প্রযুক্তির যিনি প্রধান প্রকৌশলী, তিনি এ কাজ করতে এসে একসময় মুসলমান হয়ে যান। তার মুসলমান নাম হয় মাহমুদ বোদো রাশ। এসব তাঁবুর উঁচু খুঁটিগুলোতে একধরনের পাখা সংযুক্ত করা হয়েছে, যা ঘুরে ঘুরে ঠান্ডা বাতাসের বাষ্প ছড়াতে থাকে। প্রচণ্ড উষ্ণতায় এ ঠান্ডা বাষ্প মুসল্লিদের প্রাণমন শীতল করে দেয়। এ যেন মরুভূমির ভেতরে আরেক মরুদ্যান।

মদিনায় যে কয়দিন ছিলাম, আমার কাজ ছিল মসজিদে নববিতে নামাজ পড়া। মদিনার চারপাশ ঘুরে দেখা আর মসজিদে আগত নানা দেশের নানা সংস্কৃতির মানুষের সাথে ভাববিনিময় করা। মদিনার পরে মক্কায় এবং মিনা-আরাফা-মুজদালিফায় আমার যে জিনিসটা সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে, সে কথাই এখন আলাপ করব। অনেকেই মক্কা-মদিনার মসজিদের আজান ও কেরাতের কথা বলে নিজেদের মুগ্ধতার কথা প্রকাশ করেন। এই মুগ্ধতার সংগত কারণ আছে। কিন্তু আরবি যাদের মাতৃভাষা, তাদের জন্য অনারবদের চেয়ে আজান ও কেরাতে উৎকর্ষ অর্জন করা যথেষ্ট সহজ। আমাদের জন্য যত কঠিনই হোক না কেন, এদের জন্য এটা অনেকটা সহজাত ও স্বাভাবিক বিষয়।

আমার ভালো লাগার বিষয়টা ছিল—নানা দেশের নানা ভাষার, নানা সংস্কৃতির মানুষ এখানে জড়ো হয়ে এক মহাসংগমে মিলিত হয়। আজান দেওয়ার পর চারপাশের হোটেলগুলো থেকে

বেরিয়ে দলে দলে মানুষ মসজিদের দিকে ধাবিত হয়। অথবা অন্য সময় নবিজির রওজা মোবারকের দিকে রওনা দেয়। আমি কখনো মসজিদে নববির খোলা চত্বরে দাঁড়িয়ে, কখনো মোভেনপিকের জানালা দিয়ে এই বিচিত্র মানুষের মিছিল দেখতে থাকি। বোঝাই যায়, এই মানুষগুলো অনেকদিন ধরে এখানে আসার প্রস্তুতি নিয়েছে। এই প্রস্তুতি শরীর ও মন দ্বিবিধ। এখানে আসার জন্য ছেলেরা বানিয়েছে জুঝা। আরবিতে বলে তুব। মরোক্কানরা বলে গোরান্দা। ইন্দোনেশীয়রা বলে বাজু কোকো, কখনো গামিজ। মেয়েরা বানিয়েছে আবায়। আফ্রিকানরা বলে জিলবাব। সেই জুঝা ও আবায়ার নকশা ও বিচিত্র রং দেখলে চক্ষু স্থির হয়ে যায়। যেন টেক্সটাইল সামগ্রীর এক বিচিত্র মেলা বসেছে। বিশেষ করে মেয়েদের আবায় ও স্কার্ফের নকশা রীতিমতো ফ্যাশন ডিজাইনারদের হতভম্ব করে দেবে। কত দিন-রাত্রির অধীর অপেক্ষার পর এদের প্রস্তুতি শেষ হয়েছে এবং এগুলো নিয়ে এখানে তারা হাজির হয়েছে, তা কে জানে।

আমি দেখতে থাকি। দেখতে থাকি। কিন্তু আমার চোখে ক্লাস্তি ভর করে না। বিচিত্র রঙের বর্ণালি আমার চোখকে বারবার ধাঁধিয়ে দেয়। ইন্দোনেশিয়ার মুসলমানরা দলবেঁধে আসছে। ওদের পরনে লুঙ্গি আর প্রিন্টেড শার্ট, মাথায় কিস্তি টুপি। মেয়েরা পরেছে সালোয়ার-কামিজ, এর ওপরে কখনো কখনো আবায়। কতদিন ধরে ইসলামের পবিত্র মসজিদে পাঠ করার জন্য ওরা দুআ-দরুদ মুখস্থ করেছে তার ঠিক নেই। দলবেঁধে যায় আর আল্লাহর কাছে মোনাজাত করে মিনতি জানায়—রব্বানা আতিনা ফিদদুনিয়া...

চাইনিজ মুসলমানদের তামাটে রং। বেটে খাটো চেহারা, চাপা নাক; দেখলেই চেনা যায়। ওদের সাথে কথা বলার চেষ্টা করেছি। ইংরেজি তেমন একটা জানে না। ভাঙা ভাঙা দু-একটা শব্দ বলতে পারে। মুখের ভাষায় কথা হয় না, চোখের ভাষায় কথা হয়। বাংলাদেশ থেকে এসেছি শুনে বুকে জড়িয়ে ধরে।

মাথায় শিমাগ দেখলেই বোঝা যায়, এরা জাত আরব। বেদুইন সন্তান। কিন্তু মাগরিবের মুসলমানরা শিমাগ পরে না। ওরাও আরবি ভাষায় কথা বলে, কিন্তু একটা বিশেষ ডায়ালেক্টে। এজন্য ওরা মাগরিব বলে পরিচয় দেয়। মাগরিব মানে হলো মরক্কো, তিউনিশিয়া ও আলজিরিয়া। ওদেরকেই বলে বার্বার মুসলমান। ওরাই একদিন স্পেন জয় করেছিল।

মাগরিবের মেয়েরা অনেক স্টাইলিশ। আবায়ার ওপরে স্টাইল করা স্কার্ফ। আর সেই স্কার্ফের ওপর সানগ্লাসকে ব্যান্ডের মতো যখন ঝুলিয়ে রাখে, তখন এদেরকে সত্যি মনে হয় প্রিয়দর্শিনী। এরা যেমন স্টাইলিশ, তেমনই শিক্ষিতও। এদের গায়ের রং তো অবশ্যই সাদা। কিন্তু পশ্চিমাদের সাদা রঙের মতো নয়। পশ্চিমাদের সাদার মধ্যে একধরনের ঝাঁঝালো ভাব। এদের সাদার মধ্যে আছে একধরনের স্নিগ্ধতা, একটা হোয়াইট গ্লো।

মূল আরবের মেয়েরা এত শিক্ষিত নয়, স্টাইলিশও নয়। লন্ডনে আমার এক বন্ধু বলেছিল—ওরা তো শেখদের তৃতীয়-চতুর্থ বউ হিসেবেই কাটিয়ে দেয়। ওদের লেখাপড়া, সামাজিক ভূমিকা পালনের সময় কোথায়? কথার মধ্যে রস থাকলেও সত্যতা যে আছে, তা তো অস্বীকার করা যায় না। তবে আরবীয় সমাজের এই সনাতন ভঙ্গিটা এখন কিছুটা হলেও বদলাতে শুরু করেছে।

এবার বলব কালো আফ্রিকার মেয়ে হাজিদের কথা। রঙের ব্যাপারে ওদের কোনো জাতপাত নেই। তাই ওদের জিলবাবগুলো হয় বহু বর্ণিল। প্রজাপতির রং, ফুলের রং, মাছের রং, গাছের পাতার রং—কী নেই ওদের জিলবাবে। ওরা যখন হেঁটে যায়, তখন মনে হয় নৃত্যপটীয়সী কোনো নারী সুরের লহরী তুলে হেঁটে চলেছে। ওরা খুব সুন্দর করে জায়নামাজকে চার ভাগ করে মাথার ওপর রাখে। তারপরে সেই জায়নামাজের ওপর ব্যাগ বা পানির কন্টেনার বসিয়ে দিয়ে দিব্যি হাঁটতে থাকে। ওদের হাঁটার সময় ব্যালাস্টা এত সূক্ষ্ম যে, ওগুলো নিচে পড়ে যায় না। আমার কাছে মনে হয়, ওরা কালো আফ্রিকার সহজাত ব্যালে ড্যান্সার।

এই যে বহু রং এসে একাকার হয়ে যায়, এক রং ধারণ করে, বহু সংস্কৃতির স্রোত মিলিত হয়ে এক ধারায় প্রবাহিত হয়, জাতি ও দেশের ঠিকানা বদলে এক মহাজাতীয়তা তৈরি হয়—এটাই হাজার শিক্ষা। হজ মানে শুধু কতকগুলো ধর্মীয় রিচুয়াল রীতিপদ্ধতি নয়। হজ মানুষকে বিশ্ব নাগরিক বানায়। হজ বিশ্বভ্রাতৃত্বের ডাক দেয়। হজ মুসলমানকে এক গ্লোবাল কমিউনিটির অংশীদার বানায়। এটাকেই আমরা বলি মুসলিম উম্মাহ। নবিজি বলেছেন—আমার উম্মত হচ্ছে একটা দেহের মতো। এর একপ্রান্তে ব্যথা হলে অন্যপ্রান্তে সেটা অনুভূত হয়। এই সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক চেতনার কথা হজ আমাদের বারবার মনে করিয়ে দেয়। এর সাথে হজ আমাদের শিক্ষা দেয় সবরের, আল্লাহর প্রতি নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের।

আমি মসজিদে নববির চারপাশ দিয়ে ঘুরি। ওর দেওয়াল ছুঁয়ে দেখি। কখনো ওর দরজার চৌকাঠে বসে থাকি। মার্বেল পাথরে তৈরি ওর খুঁটি জড়িয়ে কাঁদি। আর বলি, মুসলিম উম্মাহ কি আদৌ আছে? আমি মোনাজাত করে বলি—হে রহমানুর রহিম, হে করুণার রাজাধিরাজ! তুমি আমাদের মুসলিম উম্মাহ ফিরিয়ে দাও—তাওফিক দাও খোদা ইসলামে, মুসলিম জাহা পুনঃ থেকে আবাদ।

তিন

মদিনা আসার পর থেকে নবিজির রওজা মোবারকে সালাম দেওয়ার জন্য মনটা উতলা হয়ে উঠেছিল। হাজার সময় সারা দুনিয়ার হাজিরা এখানে হাজির হয়ে নবিজির শাফায়েত কামনা করে। কেউ মদিনা হয়ে মক্কায় যায়, কেউ মক্কা হয়ে মদিনায় আসে। ফলে এ সময় রওজা প্রাপ্তনে হাজিদের স্রোত তরঙ্গের মতো ফেনায়িত হয়ে ওঠে। সেই তরঙ্গস্রোতে ভাসতে ভাসতেই হাজিরা নবিজির কাছে তাদের সালাম পৌঁছায়।

বাঙালি মুসলমানের জন্য হজ ছিল একসময় আয়াসসাধ্য ব্যাপার। যোগাযোগ, অর্থনৈতিক সংগতি অনেক কিছুই আয়ত্তের বাইরে ছিল। এখন হয়তো কিছুটা দিন বদলেছে। তারপরেও বাঙালি মুসলমানের নবিজির প্রতি আবেগের কমতি হয়নি কখনো। আমাদের পল্লি গানের শিল্পী গিয়েছেন—মনে বড়ো আশা ছিল যাব মদিনায়। আরব সাগর পাড়ি দিয়ে নবিজির রওজার কাছে গিয়ে সালাম দেওয়া, সেটা সম্ভব না হলে কাউকে দিয়ে সালাম পৌঁছানোর সেই মর্মস্পর্শী আকুলতা কার মন স্পর্শ করেনি। সেই আকুলতা কি আমার মনেও দোলা দেয়নি? কি করে বলব!

নবিজির রওজা মোবারকে যাওয়ার দুটো পথ আছে। এর মধ্যে সহিহ তরিকাটা হচ্ছে রিয়াজুল জান্নাতের ভেতর দিয়ে রওজা মোবারকের সামনে হাজির হওয়া। আরেকটি হচ্ছে রওজার

সামনের প্রাচীরের ওপর থেকে জিয়ারত করা। সব হাজিই যেহেতু রিয়াজুল জান্নাতে বসে ইবাদত করতে চায় এবং রওজা মোবারকের সামনে যেয়ে মোনাজাত করতে চায়, তাই বিপুল হাজিকে নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য কর্তৃপক্ষ এখন মোবাইলে বিশেষ অ্যাপস খুলে অগ্রিম বুকিংয়ের ব্যবস্থা করেছে। সেই অ্যাপসের মাধ্যমে অগ্রিম দিনক্ষণ ঠিক করতে হয় এবং যথাসময়ে যেয়ে এটি দায়িত্বরত পুলিশের কাছে দেখালে তখন রিয়াজুল জান্নাতে প্রবেশের সুযোগ মেলে।

আমার দিনটি নির্ধারিত হয়েছিল যেদিন মদিনা থেকে চলে আসব, তার আগের দিন মাগরিবের পরে। আমি তাই দ্বিতীয় পথটি ধরে এগোনোর চেষ্টা করলাম। মাগরিবের পর মসজিদে নববির পশ্চিম ধার দিয়ে নবিজির রওজার দিকে ধাবমান হাজিদের স্রোতের ভেতরে ঢুকে ভাসতে শুরু করলাম। চারিদিকের হাজিদের স্রোতধারা যেন আমার দিকে এগিয়ে আসছে। আর সেই স্রোতের ধাক্কায় আমি তৃণের মতো নবিজির রওজার দিকে ভেসে ভেসে চলেছি। আমার এই অসহায় অবস্থা দেখে মালির মুহাম্মাদ হাসান আমার হাত খপ করে ধরে ফেলল। তারপর রীতিমতো সেই ধাবমান হাজিদের প্রবল চাপের মুখ থেকে উদ্ধার করে বলল— ভয় পেয়ো না ভায়া। প্রদীপের দিকে গেলে পতঙ্গের পাখা পোড়ে না? আর নবিজির রওজা মোবারক জিয়ারত করবা, একটু কষ্ট করতে পারবা না?

আমি অনেক কষ্টে হাসি চেপে বললাম—আমার জান যায় অবস্থা আর তুমি কবিতা করছ?

আরে না না, তুমি আর আমি তো একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি। যত স্রোতই আসুক, আমরা দুজন একসাথে মোকাবিলা করব।

আমি ওর কথায় উল্লাসিত হয়ে বললাম—কোন দেশ থেকে এসেছ?

মালি।

অনেকক্ষণ স্থির হয়ে ভেবেচিন্তে বললাম—এটা তো পশ্চিম আফ্রিকার দেশ। বামাকো এর রাজধানী। এখানে একটা বিখ্যাত মাটির তৈরি মসজিদ আছে। বহুদিন ফরাসিরা কলোনি করে রেখেছিল।

এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে গেলাম। ও শুনে বলল—তুমি তো আমার দেশ সম্পর্কে অনেক কিছু জানো।

তেমন হয়তো জানি না। তবে মুসলিম দেশ হিসেবে হয়তো একটা আভ্রহ আছে।

মুহাম্মাদ হাসান মালির সিভিল সার্ভিসে চাকরি করে। ওর মাতৃভাষা বামবারা। কিন্তু খুব ভালো ইংরেজি ও ফরাসি জানে। দরাজ গলা। ও কয়েকটা কাগজে অনেকগুলো দুআ ও দরুদ লিখে এনেছে, নবিজির রওজার সামনে পড়বে। ও-ই বলল—আমি জোরে জোরে পড়ি। তুমিও আমার সাথে পড়ো। চলো আমরা দুই ফকির একত্রে মদিনার শাহানশাহের দরবারে হাজিরা দিই।

আমি ওর প্রস্তাবে সানন্দে রাজি হয়ে গেলাম। এ রকম নিখরচায় মুর্শিদ পাওয়া কম কথা নয়। যেন মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি! আমরা যতই নবিজির রওজার দিকে যেতে থাকি, মুহাম্মাদ হাসানের গলা তত ভারি হয়ে আসে। ভেজা গলায় সে তার দুআগুলো প্রাণপণে পড়তে থাকে—

আসসালাতু ওয়াসসালামু ইয়া রসূলুল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবিউল্লাহ, আসসালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবুল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া খাইরা খালকিল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া সাইয়িদাল মুরসালিন, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা খাতামুন নাবিইন, আসসালাতু আলাইকা ইয়া রহমাতুল্লিল আলামিন, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া শাফিয়াল মুজনাবিন ।

আমি মুহাম্মাদ হাসানের সাথে পুনরাবৃত্তি করি । চারিদিকের পরিবেশ দরুদের গুঞ্জরনে কেমন যেন সজল হয়ে উঠেছে । যেন বহুদিনের জমানো মেঘ বৃষ্টির মতো ঝরতে শুরু করেছে । আমরা দুআ পড়তে পড়তে নবিজির রওজার সামনে হাজির হই । নবিজির পাশে তার দুই পুণ্য সহচর সিদ্দিকে আকবর ও উমর ফারুক (রা.) শুয়ে আছেন । আমি কান পেতে শুনি মুহাম্মাদ হাসান দুআ করে চলেছে । তার চোখে শ্রাবণের ধারা । সেই শ্রাবণ এসে আমার চোখকেও ছুঁয়েছে ।

মুহাম্মাদ হাসানের একটাই কথা—হে নুরের নবি রহমাতুল্লিল আলামিন, বিচার দিবসে তুমি কি আমাদের শাফায়েতকারী হবা না? তুমি যদি ত্রাণ না করো, আমরা তাহলে কোথায় যাব! আমারও সেই কথা । হাসান ও আমার ভাষা এখন পুরোপুরি একাকার হয়ে গেছে ।

প্রাচীরের ওপর থেকে নবিজির রওজার সামান্য অংশই দেখা যায় । প্রাচীর আমাদের ঠেকিয়ে দিয়েছে সত্য, কিন্তু আমাদের মোনাজাতের ভাষাকে ঠেকাতে পারেনি । ও ভাষাকে কোনো প্রাচীর দিয়ে ঠেকানো যায় না । আল্লাহ বলেছেন, অনুতপ্ত হৃদয়ই হচ্ছে আমার সবচেয়ে প্রিয় । জানি না সেই অনুতাপের দহনে দক্ষীভূত আমাদের দুই ফকিরের চোখের পানিতে নবিজির মন ছুঁয়েছিল কি না । বুঝতে পারিনি কখন হাজিদের স্রোতের চাপে আমরা বাইরে চলে এসেছি । মসজিদে নবিবির খোলা চতুরে দাঁড়িয়ে দেখি আকাশে তখন তারা ঝলমল করছে ।

* * *

হজে রওনা দেওয়ার আগে আমার সময়-অসময়ের হিতৈষী ইমরুল আমাকে ইহরাম ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস কিনে দেওয়ার সময় বলেছিল—আপনি যখন নবিজির রওজা মোবারকে যাবেন, তখন আপনার সেরা পোশাকটা পরে যাবেন । তার যুক্তি ছিল—আপনি দোজাহানের সর্দারের দরবারে হাজিরা দেবেন । তাঁর ইজ্জতের দিকে খেয়াল করেই আপনাকে পোশাক-আশাক পরতে হবে । তার কথার সারবত্তা অস্বীকার করতে পারিনি । তবে আমি যেটা বলতে চেয়েছি সেটা হলো, আমি দীনহীন ফকিরের বেশে যেতে চাই । মদিনার শাহানশাহের দরবারে কেঁদে কেঁদে তাঁকে আমি আমার শাফায়েতকারী হবার অনুরোধ করতে চাই । আমি তো ফকির । ফকিরের আবার সাজসজ্জার বালাই কি!

সেদিন ইমরুলের সাথে পোশাক নিয়ে বাহাসের ফয়সালা না করেই আমি মদিনায় চলে এসেছি । তাই কী পরবো আর না পরব তার ঝঙ্কি ছিল না । আর পোশাক নিয়েও আমার কখনোই কোনো গুচিটা ছিল না । তাই পায়জামা-পাঞ্জাবি টুপি মাথায় দিয়েই দ্বিতীয় দিন সহিহ তরিকা অনুসারে মাগরিবের পর নির্ধারিত সময়ে নবিজির রওজার দিকে রওনা দিই । মোবাইলের অ্যাপস খুলে অনুমতিপত্র দেখালে পুলিশ নিয়ে একটা প্লাস্টিকের বেড়া ঘেরা জায়গায় বসিয়ে দেয় । এইভাবে নির্ধারিত সময়ে অনুমতিপ্রাপ্ত মানুষগুলো জড়ো হলে এক এক করে সবাইকে পুলিশ রিয়াজুল

জান্নাতের ভেতরে প্রবেশ করায়। আজ আমি রিয়াজুল জান্নাতে একাই প্রবেশ করেছি, একাই নবিজির রওজার সামনে হাজির হব। গতদিনে নবিজির রওজা জিয়ারত করেছিলাম একটা কমুনাল মুডে। একত্রে যুববন্ধ দুআ ও ইবাদতের ভেতরে একটা শিহরন থাকে। এ শিহরন মানুষকে উজ্জীবিত করে। কিন্তু নির্জনতার এমন একটা সৌন্দর্য থাকে, যেখানে দৃষ্টিগোচর হওয়ার সম্ভাবনা নেই। আজ আমার নবিজির সাথে একান্তে, নিভৃতে আলাপন। এর মাঝে কোনো অংশীদার নেই। দৃষ্টির ভার আজ আমাকে আচ্ছন্ন করবে না। রুহানিয়াত জিনিসটা সব সময় দৃষ্টির অগোচরে থাকে।

রিয়াজুল জান্নাতের জায়গাটুকু বেশি বড়ো নয়। টেনে টেনে কয়েক শ মানুষ ধরতে পারে। ইবাদতের জন্য আধাঘণ্টার মতো সময় দেয়। তারপরেই পুলিশ এসে বের করে দেয়। এখানে কেউ নামাজ পড়ে, কুরআন তিলাওয়াত করে, কেউবা জিকির-আজকার করে, কেউ কেউ চোখের পানিতে বুক ভাসায়। আবার কাউকে কাউকে দেখেছি রিয়াজুল জান্নাতে এবং নবিজির রওজার সামনে গিয়ে ছবি তোলে। এটা আমার কাছে শোভন মনে হয়নি। প্রত্যেকটি স্থানের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকে, যা রক্ষা করা উচিত।

রিয়াজুল জান্নাত থেকে বের হয়ে আমি সরাসরি নবিজির রওজার সামনে এসে দাঁড়াই। সোনা ও অন্যান্য ধাতুর জালি দিয়ে পুরো রওজা ঢেকে দেওয়া হয়েছে। ভেতরের কিছুই বোঝা যায় না। ভেতরে কেউ প্রবেশ করতেও পারে না। উচ্চপদস্থ গণ্যমান্য ব্যক্তিরাই কেবল সৌদি সরকারের অনুমতি নিয়ে ভেতরে ঢুকতে পারে। আমাদের মতো आमজনতার পক্ষে সেখানে ঢোকার সুযোগ নেই। দূরে দাঁড়িয়ে ফাতিহা ও অন্যান্য দুআ পড়তে হয়।

এখানে হাজির হয়ে একজন ঈমানদারের মনে যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, আলোড়ন-অনুভূতি সৃষ্টি হয়, তা ভাষায় প্রকাশ করা দুর্লভ। প্রায় সকল অনুভূতি শব্দে ধরা যায়, কিন্তু রওজা মোবারকের সামনের অনুভূতি শব্দের ব্যাখ্যায় মূর্ত করা কঠিন। আমার মনে হয়েছিল জীবনের সব আকাঙ্ক্ষাকে বাদ দিয়ে আমি এক মহাজাগতিক আকাঙ্ক্ষার সামনে নিজেেকে নিঃশেষ করছি। এখানে এসে যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কাছে সম্পূর্ণ নিবেদন করতে পারে, তার এক নবজন্ম ঘটে।

আমি রওজার সামনে দাঁড়িয়ে ভাবছি, এখানেই একদিন নবিজি বসবাস করতেন। তাঁর পুণ্য স্ত্রীরা তাঁর সাথেই থাকতেন—আয়শা, হাফসা, সাওদা। নবিজির বাসার ধারেই থাকতেন বিবি ফাতিমা ও তাঁর স্বামী হজরত আলি। নবিজি প্রধানত আয়শার গৃহে থাকতেন। এ গৃহে, যার সামনে আমি এখন দাঁড়িয়ে, অসংখ্যবার আল্লাহর ওহি নাজিল হয়েছে।

এখান থেকেই আমাদের সভ্যতার চেরাগ জ্বলা শুরু হয়েছিল। আমি টাইম মেশিনের মতো ১৪০০ বছর পেছনে চলে যাই এবং ইতিহাসের কপাটগুলো এক এক করে খুলতে থাকি। এখানেই আমাদের স্মৃতিগুলো জরিন হরফে লেখা আছে। একবার ভাবি নবিজির এই স্মৃতিবিজড়িত স্থানটুকু, যা এখন মসজিদে নববির অংশ, এটাকে শুধু সোনা ও রূপার জালি দিয়ে না মুড়ে সৌন্দর্যের একটি তুলনাবিহীন উপমা হিসেবে সংরক্ষণ করা যেত বৈকি! মুসলিম ইতিহাসে সৌন্দর্য কলাবিদের কোনো অভাব হয়নি। এরা তাদের মনের মাধুরী মিশিয়ে যত্নের সাথে মুসলিম সভ্যতার সৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠতম উপমাটি নির্মাণ করতে পারতেন। কিন্তু নানা ঐতিহাসিক ও

সমাজ বাস্তবতার কারণে হয়তো সেটা সম্ভব হয়নি। তন্মধ্যে একটা হলো, এটা খুবই স্পর্শকাতর জায়গা। মুসলিম খলিফা ও আলেমরা তাই এ নিয়ে বেশি এগোতে চাননি।

আমার এ চিন্তার সাথে অনেকে অমত করবেন জানি। সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু পুরো ব্যাপারটা আমি বোঝার চেষ্টা করেছি ধর্ম ও সংস্কৃতির সম্মিলিত জায়গা থেকে। নবিজির উপমা তো কোনো কিছুতেই সম্ভব নয়। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম কবিতা কিংবা শ্রেষ্ঠতম কোনো সৌন্দর্যশৈলীও তার উপমা হতে পারে না। এ কারণেই শেখ সাদী লিখেছিলেন, তিনি কামালিয়াতের শীর্ষে পৌঁছে গেছেন। একজন আশেকে রসূল হিসেবে আমি আমাদের সভ্যতার এই বাতিঘরকে একটি সৌন্দর্যের উপমা হিসেবে দেখতে চাই। আমার এই চাওয়ার মধ্যে কোনো খাদ রাখতে চাই না।